ভারত আমার



সতীকুমার নাগ

ভারত আমার

সতীকুমার নাগ

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার
কলিকাতা

প্রথম প্রকাশ
ডিসেম্বর, ১৯৫৭

মূল্য ঃ পঁচিশ নয়া পয়সা

পশ্চিমবঙ্গ-সরকারের শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে, প্রচার-অধিকর্তা শ্রীপ্রকাশস্বরূপ মাথুর কর্তৃক প্রকাশিত এবং পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মুদ্রণে অধীক্ষক শ্রীশুভেন্দু মুখোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

ভূমিকা

শিশু এবং সদ্যসাক্ষর পাঠকের উপযোগী সাহিত্য রচনা সমাজ-শিক্ষা পরিকল্পনার একটি বিশেষ অঙ্গ। ঐরূপ সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্যে গত দুই বৎসর যাবৎ পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক সাহিত্য-কর্মশালা আয়োজিত ও পরিচালিত হইতেছে। কোন বিশেষ সাহিত্য-ব্রতীর তত্ত্বাবধানে কয়েকজন নির্বাচিত লেখক লইয়া সাহিত্য কর্মশালা সংগঠিত হয়। নতুন আঙ্গিকে এবং বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে লেখকগণ নানা বিষয়ে সাহিত্য রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। দেড়মাস কাল তাঁহারা পরস্পরের সান্নিধ্যে থাকিয়া রচনার বিষয়বস্তু, রচনার ভাষা এবং রচনাশৈলী ইত্যাদি বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেন। পুনঃপুনঃ আলোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তনের ফলে রচনাগুলি যতদূর সম্ভব নির্ভুল, সহজ ও সুখপাঠ্য হইয়া উঠে।

১৯৫৬-৫৭ সনে বাণীপুরে দ্বিতীয় সাহিত্য-কর্মশালার অধিবেশন হইয়াছিল। ইহার পরিচালনা ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব ন্যস্ত হইয়াছিল শিশুভারতী-সম্পাদক প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের উপর। ষোলজন লেখক এই কর্মশালায় যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমবেত প্রচেষ্টায় মোট ষোলখানা শিশু ও কিশোর-পাঠ্য বই রচিত হইয়াছে। এই বইখানি উহাদের অন্যতম। শিশু ও কিশোর পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবোধ্য, সহজ ও সরল ভাষায় বইগুলি লিখিত হইয়াছে। আশা করা যায় যে, বাঙলার শিশু ও কিশোর সম্প্রদায় এই বইগুলি পাঠ করিয়া আনন্দ ও জ্ঞান লাভ করিবে।

সাহিত্য-কর্মশালার পরিচালক শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও তাঁহার সুযোগ্য সহকর্মিগণ যে নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতার সহিত এই গুরুত্বপূর্ণ কার্য সম্পন্ন করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ।

নিখিলরঞ্জন রায়,
সমাজশিক্ষার প্রধান পরিদর্শক,
শিক্ষা-অধিকার, পশ্চিমবঙ্গ

ভারত আমার

বিশাল হিমালয় ভারতের উত্তরে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পাদদেশে বনভূমি। কি সুন্দর! লতায় পাতায় ফুলে ফলে ভরা। বরফে ঢাকা তার চূড়াগুলি যেন আকাশ-ছোঁয়া। সূর্যের আলোতে চিকমিক, ঝিকমিক করে সাদা বরফ। হিমালয়ের সবচেয়ে বড় চূড়া—এভারেস্ট। এত উঁচু চূড়া পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

তার দক্ষিণে শুধু জল আর জল। সাগর চলেছে, ঢেউ আর ঢেউ তুলে।

সে অনেক, অনেক কাল আগের কথা বলছি।

ভারতের আদি পুরুষদের ঘরবাড়ি ছিল না। তারা বাস করত পাহাড়ে, গুহায়, বনে-জঙ্গলে। ঘুরে ঘুরে বেড়াত তারা। তীর-ধনুক নিয়ে শিকার করত। পশুপাখি মারত। তারা কাঁচা মাংস খেত। তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, আর তারা দেখতে ছিল বেঁটে।

নদ-নদী, আকাশ, তারা, সূর্যের পূজা করত। সাপ পূজা তারাই প্রথম করেছিল।

তাদের বলা হ'ত বুনো বা অসভ্য।

আজ থেকে পাঁচ-ছয় হাজার বছর আগের কথা বলছি।

ভারতে আর এক জাতি এল। কোথা থেকে তারা প্রথম এল, সে কথা কেউ বলতে পারে না।

অনেকে বলেন, আগে তারা ভূমধ্যসাগরের তীরে বাস করত। বেলুচিস্থান পেরিয়ে তারা এদেশে এসে হাজির হ'ল। প্রথমে তারা এল সিন্ধুনদের তীরে। এখানে বসবাস শুরু করল।

তাদের গায়ের রঙ ছিল কালো, আর মাথার চুল ছিল কোঁকড়ান।

তারা লিখতে, পড়তে জানত। তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করত। জমিতে হাল চষত। বীজ বুনত। ফসল ফলাত। গরু, ছাগল পুষত। তা ছাড়া নিজেরা ঘরবাড়ি তুলত। পথ-ঘাট, মন্দির, বিদ্যালয়—এ সবকিছুই তাদের ছিল। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সুন্দর শহর। তাদের বসতি গ'ড়ে ওঠে সিন্ধুনদের তীরে।

কী ক'রে তাদের কথা জানতে পেরেছি, সেই কথা বলছি।

মাটির তলায় তাদের শহরের খোঁজ পেয়েছি—সিন্ধুনদের তীরে।

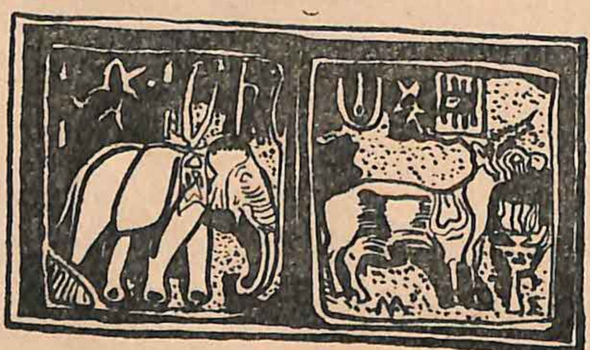
দেখ না, তারা কত রকম জিনিস ব্যবহার করত! সব জিনিসই ছিল দামী দামী।

মেয়েদের গায়ের গয়না! তাতে কত রকমারি নকশা কাটা।

ছোটদের খেলনা! কত রঙচঙে, কত বাহার সেসব খেলনার!

চীনা মাটির বাসন! তার উপর আঁকা কত লতা-পাতার ছবি!

সীল মোহর! জীবজন্তুর ছবি রয়েছে তাতে।



এসব জিনিস সংগ্রহশালায় রাখা হয়েছে। তারা তাদের মনের কথা জানাত ছবি এঁকে, অক্ষরের বদলে। ঐ ছিল তখনকার দিনের তাদের ভাষা। তারা জাহাজ বানাত কাঠ দিয়ে। বড় বড় নৌকা ছিল তখনকার দিনের জাহাজ। এ জাহাজে চ'ড়ে তারা দূর, দূর দেশে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে যেত।

ভারতে শুধু তাদের বসতি গ'ড়ে ওঠে নি; গ'ড়ে উঠেছিল তাদের সভ্যতা, তাদের শিক্ষা-দীক্ষা।

একদিন কিন্তু তারা এই সিন্ধুনদের তীর ছেড়ে চ'লে গেল। তারা কোন্ দিকে গিয়েছিল, তা কেউ বলতে পারে না। তবে অনেকে বলেন, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে তারা চ'লে যায়। তাদের চ'লে যাওয়ার পর থেকে তাদের সভ্যতারও ভাঙন ধরল।

আবার আর এক দিকে ভারতের দক্ষিণে নূতন এক সভ্যতা গ'ড়ে উঠল। দক্ষিণ ভারতেও নূতন নূতন শহর গ'ড়ে উঠল ধীরে ধীরে।

এ নূতন সভ্যতা যারা গ'ড়ে তুলেছিল তারা ছিল দ্রাবিড় জাতি।

দ্রাবিড়েরা ভারতের সোনা, মুক্তা, শঙ্খ, মিহি-সুতীর ধুতি, শাড়ি ব্যবহার করত। সাগর পাড়ি দিত দূর দূর দেশে।

এ সময়কার সভ্যতাকে বলে সিন্ধুসভ্যতা।

তারপর সবার শেষে ভারতে এল নূতন আর এক দল। তারা আগে ছিল ইউরোপের মধ্যভাগে। সেখানে দিনের পর দিন লোকসংখ্যা বাড়তে থাকল। তাই তারাও ধীরে ধীরে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। তারা ভারতে এসে হাজির হ'ল হিমালয়ের উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ ধ'রে।

উত্তর ভারতে তারা বাসা বাঁধল। এ অঞ্চল ছিল উর্বরা ভূমি। ফসল ফলত। ফসল ছিল ব'লে তারা ঐখানেই রয়ে গেল। এখানকার অঞ্চলে যারা আগে ছিল, তারা নূতন দলকে হটিয়ে দিতে চাইল। এর ফলে দু' দলের বাঁধল লড়াই। তারা কিন্তু নূতনদের হারাতে পারল না। নিজেরাই হটে গেল দক্ষিণ দিকে। সিন্ধুনদের তীরে তারা বসবাস শুরু করতে থাকল। এখানকার অধিবাসীদের 'হিন্দু' বলত। 'হিন্দু-ধর্ম' এখান থেকেই আরম্ভ হয়েছিল। 'সিন্ধু' থেকেই 'হিন্দু' শব্দটি আসে।

জাতিতে তারা ছিল—আর্য। তাদের সভ্যতাকে বলা হ'ল—আর্য-সভ্যতা।

আর্যরা ছড়িয়ে পড়ল ভারতের নানাদিকে। আর্যরা দ্রাবিড়দের চেয়ে অনেক বিষয় বেশি জানত।

আর্যদের সময় জাতি-বিচার ছিল। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও বৈশ্য—চার রকম জাতি ছিল।

ব্রাহ্মণরা যাগ-যজ্ঞ, পূজা অর্চনা করতেন। ক্ষত্রিয়রা রাজ্য দেখতেন। যুদ্ধে যেতেন। বৈশ্যরা ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। শূদ্ররা জমি চাষ-বাস করত, ব্রাহ্মণদের সেবা করত।

তখনকার সমাজের ব্যবস্থা ছিল সুন্দর। সমাজ ছিল ছোট ছোট পরিবার নিয়ে। পরিবারের বড় কর্তা ছিলেন পিতা। সবাই তাঁর কথা মানত। মেয়েরাও লেখাপড়া শিখত। সমাজে মেয়েদের সম্মান ছিল।

ঋষিদের আশ্রম ছিল। আশ্রমে তাঁরা তপস্যা করতেন। ঋষির আশ্রমে ছেলেরা আসত। ঋষিই ছিলেন তাদের গুরুমশায়। গুরুমশায় তাদের লেখাপড়া শিখাতেন।

সংস্কৃত ছিল তখনকার ভাষা। মুনি ঋষিরা সংস্কৃতে কথা বলতেন। বই লিখতেন ঐ ভাষায়। তাঁরা অনেকে বই লিখেছেন ধর্ম বিষয়ে। আর্যদের ধর্মের প্রধান বই বেদ। বেদে সকল দেবদেবীর কথা লেখা আছে। বেদের ভাষাও সংস্কৃত। বেদ চারভাগে ভাগ করা আছে—ঋক্, যজু, সাম্ ও অথর্ব।

ধর্ম বইই শুধু তাঁরা লিখেন নাই, তাঁরা সেযুগের বড় বড় যুদ্ধের ঘটনা ও রাজা-রাজড়াদের কথাও লিখেছেন।

তাঁদের লেখা দু'খানা মহাকাব্য আছে—'রামায়ণ' আর 'মহাভারত'। বীর রাজাদের কথা লেখা আছে। তা ছাড়া আছে, তখনকার সমাজের হালচাল, সমাজের আইন-কানুনের কথা।

'রামায়ণ' লিখেছেন বাল্মীকি মুনি। আর 'মহাভারত' লিখেছেন বেদব্যাস মুনি। তখনকার সময়কে বলা হয়—মহাকাব্যের যুগ।

বুদ্ধদেব

মহাকাব্যের যুগের পর এল বৌদ্ধযুগ।

বুদ্ধদেব ছিলেন রাজপুত্র। রাজপুত্র হয়েও তিনি সিংহাসনে বসলেন না।

মানুষ কী ক'রে দুঃখকে এড়িয়ে চলতে পারে, কী কাজ করলে মানুষ সুখী হ'তে পারে, তিনি এসব কথা ভাবেন।

একদিন তিনি রথে চ'ড়ে শহর দেখতে গেলেন। তিনি দেখলেন, একজন থুড়থুড়ে বুড়োকে। লাঠিতে ভর দিয়ে হেঁটে চলেছে। আর দেখলেন, একটি মরা-মানুষকে চারজন কাঁধে ক'রে নিয়ে যাচ্ছে। এসব দেখে তাঁর মন খারাপ হয়ে যায়। মানুষ এ সংসারে কত দুঃখ, কত কষ্টই না পায়!

কিছুদূর যেতে তিনি দেখলেন এক সাধুকে। বেশ হাসিখুশি মুখখানা তাঁর। বড় ভাল লাগল তাঁর ঐ সাধুকে।

সত্যি, এ সাধুই সুখী! এ সংসারে তাঁর কোন টান নেই। শেষে তিনি সাধুর পথই বেছে নিলেন।

সংসারের মায়া কাটিয়ে তিনি বেরিয়ে পড়লেন। নিরিবিলিতে ব'সে তপস্যা করতে থাকলেন। তপস্যায় সফল হলেন।

বুদ্ধদেবের কাছে সবাই আসতে থাকল। এমন কী দূর দূর দেশের রাজা, মহারাজা, ধনী সওদাগরেরাও এলেন।

২

তিনি সবাইকে ডেকে বললেনঃ তোমরা ভাল পথে চল। সত্য কথা বল। ভাল কাজ কর। তাতে ভাল ফল পাবে। কাউকে দুঃখ দিও না। হিংসা করবে না। সবাইকে ভালবাস। অহিংসাই বড় ধর্ম।



অনেকেই তাঁর শিষ্য হলেন। তাঁর শিষ্যরা হলেন বৌদ্ধ। আর তাঁর ধর্মের নাম বৌদ্ধধর্ম।

ধীরে ধীরে ভারতে ছড়িয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্ম।

গ্রীকরাজা আলেক্‌জান্দার

ভারতবর্ষ তখন অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক রাজ্যে একজন ক'রে স্বাধীন রাজা ছিলেন। রাজায় রাজায় বনিবনা ছিল না। রাজাদের লড়াই লেগেই থাকত। একতার অভাবেই রাজাদের ক্ষমতা ক'মে এল। বিদেশীরা ভারত আক্রমণ করার সুযোগ পেল।

গ্রীস দেশের রাজা আলেক্‌জান্দার এদেশ আক্রমণ করলেন। সঙ্গে তাঁর ঘোড়-সওয়ার সৈন্যেরা। পাঞ্জাবের ঝিলাম নদীর তীরে শিবির ফেললেন।

অনেক রাজাই আলেক্‌জান্দারের কাছে হেরেছেন। পুরু রাজাকে তিনি বশে আনতে পারেন নি। পুরু বীর। তিনি বীরের মত যুদ্ধ করলেন গ্রীকরাজার সঙ্গে। শেষে পুরুরাজের সঙ্গে তাঁর সন্ধি হ'ল।

গ্রীস দেশের শিল্প, কারুকাজ, খোদাই-করা পাথরমূর্তির সঙ্গে এ দেশের পরিচয় হ'ল। আবার তেমনি ভারতের শিল্প-বাণিজ্য গ্রীস দেশেও গিয়েছিল।

এভাবে দুই সভ্য জাতির সঙ্গে যোগাযোগ হ'ল। তার ফলে দুই জাতির উপকার হ'ল—শিল্পে, ব্যবসা-বাণিজ্যে। ভারতের সঙ্গে বিদেশীদের সম্পর্ক এখান থেকে গ'ড়ে ওঠে।

মগধরাজ চন্দ্রগুপ্ত

ভারতের অনেকগুলি রাজ্য গ্রীকেরা জয় করেছিলেন। আলেক্‌জান্দারের সেনাপতিরা এসব রাজ্য শাসন করতেন। এ সময় মগধ রাজ্যের শক্তিশালী রাজা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত। তিনিই গ্রীকদের এ দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

এ সময় গ্রীস থেকে একজন রাজদূত এলেন। নাম তাঁর মেগাস্থিনিস। তিনি অনেকদিন ভারতে ছিলেন। কিছুকাল তিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায়ও ছিলেন। ভারত সম্বন্ধে তিনি একখানা বই লেখেন। তখনকার দিনের অনেক কথা ঐ বইতে লেখা আছে।

চন্দ্রগুপ্ত বীর ও সাহসী সম্রাট ছিলেন। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র শহরে। শহরটি কাঠের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল। রাজপুরীও ছিল কাঠের তৈরি। বড় বড় রাস্তা ছিল। চাষবাস ভাল হ'ত। জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। শত্রুরা সহজে দেশে আসতে পারত না। দেশের সবাই সুখে বসবাস করত। রাজা অনেক সময় হাতীতে চ'ড়ে শহর দেখতে যেতেন। তাঁর সঙ্গে পুরুষ ও মেয়ে প্রহরীরাও যেত রাজার মাথায় রাজছত্র ধ'রে। চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় এক ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। নাম তাঁর চাণক্য। তাঁর পরামর্শে চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য চালনা করতেন। টাকাকড়ি ও অন্যান্য বিষয় নিয়ে তিনি একখানা বই লিখেন। বইখানার নাম—'অর্থশাস্ত্র'

সম্রাট অশোক

ডাকটিকিটখানার উপর কিসের ছবি?

তিনটি সিংহের মূর্তি তাতে আঁকা আছে, নয় কী?

কাশীতে সারনাথের মন্দির আছে। সে মন্দিরের থামের মাথায় রয়েছে চারটি সিংহ, সামনের দিকে তিনটি আর পিছনে একটি। আর তার নিচে দু' পাশে দু'টি গোল অশোকচক্র আর তার মাঝে একটি ষাঁড়ের ছবি। এতে সম্রাট অশোকের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

অশোক মগধের সম্রাট। অশোকের ঠাকুরদাদা ছিলেন চন্দ্রগুপ্ত।

অশোকই প্রথম বৌদ্ধধর্ম দেশে দেশে প্রচার করেন।

তিনি লিখলেন পাহাড়ের গায়ে আর পাথরের উপর খোদাই ক'রে বুদ্ধদেবের বাণী—তাঁর উপদেশ।

পিতামাতাকে মানবে। সত্য কথা বলবে। পশুপাখি মারবে না। সবাইকে ভালবাসবে। অহিংসাই বড় ধর্ম।

তা ছাড়া, অশোক দেশ-বিদেশে লোক পাঠালেন। তাঁরা বুদ্ধদেবের উপদেশ চারদিকে বলে বেড়ালেন। তাঁর ছেলে মহেন্দ্র ও মেয়ে সংঘমিত্রাকে সিংহলে পাঠালেন। তাঁরা দু'জনে বুদ্ধদেবের কথা সেখানে প্রচার করলেন।

চীন, জাপান, তিব্বত, জাভা, রেঙ্গুন দেশেও ছড়িয়ে পড়ল বুদ্ধদেবের ধর্ম।

অশোক সম্রাট হ'লেও, থাকতেন সাধারণ মানুষের মত।

অশোক ভালবেসে সবার মন জয় করেছিলেন, তাই তিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট।

সোনার যুগ

ভারতের সেকাল ছিল সোনার যুগ।

সবাই মিলে মিশে বাস করত। কাজ করত এক সঙ্গে। রাজায় প্রজায় মিল ছিল। রাজভাণ্ডার সবার জন্য খোলা থাকত। কারও কোন অভাব ছিল না। সবাই সুখে, শান্তিতে ছিল।

সবাই কাজ করত। হাতে-তৈরি হ'ত কত রকম সুন্দর সুন্দর জিনিস।

সেকরা রকমারি গয়না বানাত। তাতে কত নকশাই না আঁকা!

তাঁতিরা তাঁত বুনত। হাতে-বোনা কত রকম কাপড়! সে যুগেও মসলিন কাপড়, কাশ্মীরি শাল ছিল।

তা ছাড়া লেখাপড়ার চর্চা ছিল।

শিল্পী ছবি আঁকতেন। কী সুন্দর! তৈরি হ'ত পাথরে-গড়া মূর্তি। কত চমৎকার মূর্তি সেসব! সে কোন্ যুগের আঁকা অজন্তা গুহার ছবি! আজও সেসব ছবি মনে হয় নূতন!

নাচ ও গান—এ দু'য়েরই আদর ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য চলত দেশ-বিদেশে।

সে যুগে চীন থেকে বেড়াতে এলেন ফা-ইয়েন। তিনি এ দেশ দেখে ভারি খুশি হলেন। চোখে তিনি যা যা দেখলেন, তা তিনি লিখলেন একখানা বইতে।

সে কথাই এখানে বলছি।

ধনে, গুণে, মানে এদেশ বড়। দেশে বিদ্যালয় ছিল। সেসব বিদ্যালয়ে নামী নামী পণ্ডিতরা পড়াতেন। বড় বড় পথঘাট ছিল। পথে পথে ছিল পান্থশালা—পথিকদের বিশ্রামের জায়গা। দেশে চোরডাকাতের ভয় ছিল না। একজন আর একজনকে ভালবাসত। সমাজের নিয়মকানুন সবাই মানত। তখন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী লোক ছিল বহু। হিন্দুদের দেবদেবীর মন্দিরও ছিল। সেসব মন্দিরের গায়ে দেবদেবীর মূর্তি আঁকা ছিল। হিন্দুরা বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিবের পূজা করতেন।

রাজা নিজে বিচার করতেন। কেউ অপরাধ করলে, তাকে রাজা সাজা দিতেন। রাজার রাজসভায় কবিরাও ছিলেন। কবির যশে রাজার যশ, রাজ্যের গৌরব।

ভারতে মুসলমান

হীরা, পান্না, মণি, মাণিকের দেশ—এ সোনার ভারত।

বিদেশী রাজাদের মনে লোভ জাগত এ দেশ জয় করার। তাই গজনীর সুলতান মাহ্মুদ ভারত আক্রমণ করলেন। সোনাদানা যা পেলেন, তা তিনি দু'হাত ভ'রে লুটে নিলেন। তিনি সতর বার ভারত আক্রমণ করেন, লুটে নেন এর ধনরত্ন।

তারপর ভারতে এলেন মহম্মদ ঘোরী। তিনি কিন্তু লুটপাট ক'রেই ক্ষান্ত হলেন না, এ দেশ জয় ক'রে তিনি এখানেই তাঁর রাজ্য গড়লেন।

রাজপুতানা রাজপুতদের দেশ। মুসলমানেরা তাঁদের বশে আনতে পারেন নি। তাই অনেক দিন ধ'রে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ চলে।

মুসলমানেরা ভারতে বসবাস শুরু করলেন। ভারতের সভ্যতার সঙ্গে নূতন এক ধারা এসে মিশল।

তারপর নূতন আর একদল মুসলমান এলেন। তাঁরা ছিলেন মোগল।

প্রথমে মোগলেরাও এ দেশে এসে লুটপাট করতেন আবার চলে যেতেন।

এক মোগল কিন্তু ভারতে স্থাপন করলেন মোগল সাম্রাজ্য।

প্রথম মোগল বাদশাহ হলেন বাবুর।

তিনি আগ্রাতে রাজধানী করলেন। বেশি দিন বাবুর রাজত্ব করেন নি।

মোগল বাদশাহদের মধ্যে আকবর ছিলেন শ্রেষ্ঠ। তিনি ছিলেন বীর ও যোগ্য বাদশাহ। তাঁর রাজধানী ছিল দিল্লীতে। সবাইকে তিনি একভাবে দেখতেন। অনেক হিন্দু তাঁর রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন, তাঁর রাজত্বে হিন্দু-মুসলমান মিলেমিশে থাকুক।

আকবর নিজে গুণী ছিলেন। তিনি বিদ্যার আদর করতেন। তাঁর রাজসভায় বড় বড় গায়ক, পণ্ডিত ও কবিরা ছিলেন।

আকবর শৌখিন ছিলেন। অনেক টাকাকড়ি খরচ ক'রে বড় বড় দালানকোঠা তুলেছিলেন। আগ্রার রাজপ্রাসাদে কত রকমের না ফুলের বাগান ছিল। কোন্ ফুলের কী নাম তা তিনি দেখে বলতে পারতেন।

মোগল রাজত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য, শিল্প, কারুকাজ সবকিছু মিলে ভারত বড় হয়ে উঠেছিল। এমন কী ইউরোপ থেকে ইংরেজ বণিকেরা ও পাদ্রীরা তাঁর রাজসভায় এসেছিলেন।

তারপর, তাঁর ছেলে জাহাঙ্গীর দিল্লীর বাদশাহ হলেন। জাহাঙ্গীর ইংরেজদের এ দেশে ব্যবসা করার জন্য সনদ দিলেন। ইংরেজরা তখন এ দেশে কারবার ফেঁদে বসলেন। কারবার দেখাশোনার জন্য তাঁরা একটি কোম্পানি করলেন—ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি।

জাহাঙ্গীরের পর দিল্লীর বাদশাহ হলেন শাজাহান। তিনি তৈরি করেছিলেন বড় বড় প্রাসাদ। তাঁর তৈরি দিল্লীর লাল কেল্লা, দেওয়ান-ই-আম, ময়ূর সিংহাসন, কোহিনূর মণির মুকুট এসব তাঁর কালের ঐশ্বর্য প্রমাণ করে। ময়ূর সিংহাসনে বসে, কোহিনূর মণির মুকুট মাথায় প'রে, শাজাহান দরবারে বসতেন।

আগ্রায় যমুনা নদীর তীরে তাজমহল সৌধটি আছে। সাদা মর্মর পাথরে তা তৈরি। শাজাহানের বেগমের নাম ছিল মমতাজ। তাঁরই কবরের উপর এ প্রাসাদ। বেগমের নামে এর নাম 'তাজমহল'।

তারপর শাজাহানের রাজত্ব শেষ হয়ে এল। ক্রমে মোগল রাজত্বের ভাঙ্গন ধরল! এর প্রধান কারণ ছিল, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একতার অভাব। তা ছাড়া, সিংহাসনে এলেন একের পর এক দুর্বল সুলতান। তাঁরা পারলেন না দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনতে। দিনের পর দিন মোগল শক্তি ক্ষীণ হয়ে পড়তে লাগল।

ভারতে ইংরেজ

মোগল সম্রাটের রাজকোষ ধন-দৌলতে ভরা—এ কথা ইউরোপের লোকেরা জানত।

সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কী ক'রে তারা ভারতে আসতে পারে, তার পথ খুঁজে বেড়ায়।

১৪৯৮ সাল।

সবার আগে পর্তুগীজরা সমুদ্রপথে ভারতে এলেন। তাঁদের জাহাজ এসে ভিড়ল কালিকট বন্দরে।

সেখানকার রাজা ছিলেন একজন হিন্দু। পর্তুগীজদের দলপতি ছিলেন ভাস্‌কো-ডি-গামা। তিনি রাজার কাছে হাজির হয়ে বললেন, "আমরা বিদেশ থেকে এসেছি। এখানে ব্যবসা-বাণিজ্য করতে চাই। তার অনুমতি দিন।"

রাজা খুব ভাল মানুষ। তিনি তাঁদের অনুমতি দিলেন। পর্তুগীজরা তখন থেকে এদেশে ব্যবসা করতে শুরু করলেন।

তারপর একের পর এক আসতে লাগল ওলন্দাজ, ফরাসী আর ইংরেজ বেনের দল।

ভারতের নানা জায়গায় তাঁদের ব্যবসা ছড়িয়ে গেল।

ইংরেজরা চাইলেন, তাঁরা একাই এ দেশে থাকবেন। আর তাঁরাই এখানে কারবার করবেন।

এ কথা অন্যেরা মানবে কেন?

তার ফলে, ইংরেজদের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধল। ইংরেজরা তাদের হটিয়েও দিলেন। তখন থেকে ইংরেজরাই এ দেশের কারবারে একচেটিয়া হয়ে পড়লেন।

কারবার করতে এসে ইংরেজরা ভারত দখল করলেন।

আর কী?

ভারতের রাজতক্তে তাঁরা পাকা হয়ে বসলেন। দেশ জুড়ে তাঁরা হলেন রাজা, আর এ দেশের লোকেরা হ'ল তাঁদের প্রজা।

দেশ স্বাধীন হ'ল

আবার দেশকে কী ক'রে স্বাধীন করব, এ হ'ল দেশের লোকের ভাবনা।

দেশের লোক চাইল না, ইংরেজরা এ দেশে বাস করুক।

একদিন হ'লও তাই! পৃথিবীর সেরা মানুষ, আমাদের জাতির জনক গান্ধীজী ইংরেজদের বললেন, "তোমরা আমার দেশ ছেড়ে, তোমাদের দেশে ফিরে যাও। নিজের দেশ, নিজেরাই দেখব।"

গান্ধীজীর এ কথায় দেশের লোকেরা ব'লে উঠল, "বাপুজী, তুমি ঠিক বলেছ। তুমি আমাদের পথ দেখাও।"

সারা দেশে এক আন্দোলন শুরু হ'ল। এই আন্দোলন—১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন—নামে ইতিহাসে লেখা থাকল।

বিদেশী ইংরেজরা এ দেশ ছেড়ে চ'লে গেলেন।

এতকাল ধ'রে ইংরেজের যে পতাকাটি উড়ছিল, সেখানে উড়ল স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা তিন-রঙা—মাঝখানে তার 'অশোকচক্র'।

১৯৪৭ সাল, ১৫ই আগস্ট আমাদের দেশ—সোনার ভারত—স্বাধীন হ'ল।

আমরা স্বাধীন হলাম! আমাদের দেশ আমরাই শাসন করছি। আমরাই দেশের সবকিছু।

আজ ভারতের গৌরব, ভারতের মহিমা ছড়িয়ে পড়েছে দেশবিদেশে।

জানো কতদিন পর?

দু'শো বছর পর!

নূতন ক'রে গ'ড়ে উঠেছে দেশের সব। নূতন যুগের মানুষ আমরা।

আবার শুরু হ'ল, স্বাধীন ভারতের নূতন ইতিহাস।

পবমু-৫৭/৮-৫০৯৪এফ-৫২৫০

India

सत्यमेव जयते